সংবাদ 395
তারিখ ২০/৮/৮১
পৃষ্ঠা

অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে : শ্বেতপত্র

সেনাবিদ্রোহ দেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি

চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহ যাতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয় সেই সেনাবিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত সকল ব্যক্তিই সেনাবাহিনীর আইনের আওতাধীন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে সুযোগও তাদের পছন্দ অনুযায়ী আত্মপক্ষ সমর্থনের অফিসারদের দেয়া হয়েছে।

বাসসর এ খবরে উল্লেখ করা হয় যে চট্টগ্রাম সেনাবিদ্রোহ সম্পর্কিত শ্বেতপত্রের পূর্বানুবৃত্তিতে বলা হয় কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত আত্ম পক্ষ সমর্থনকারী অফিসারগণ সকলেই সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসার এবং তাদের পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বহু ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকারী এবং আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁরা সামরিক ও অসামরিক উভয় আইন সম্পর্কে দক্ষ এবং এ ধরনের মামলায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

রোববার প্রকাশিত শ্বেতপত্রের বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম কিস্তিতে একথা বলা হয়।

এতে বলা হয় চট্টগ্রাম সেনাবিদ্রোহের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সকলেই সেনাবাহিনীর আইনের আওতাধীন বলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার (সেনাবাহিনীর আইনের ৩১ ধারা অনুযায়ী)— যা প্রেসিডেন্টের মৃত্যু ঘটায় অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এটি একটি মারাত্মক ধরনের সামরিক অপরাধ বলে বিবেচিত। এতে বলা হয় বিদ্রোহ এমন এক গুরুতর অপরাধ যা কেবল সামরিক কমান্ড ও শৃংখলাকেই বিঘ্নিত করে না বরং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে দেশের মূল অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে।

শ্বেতপত্রে সেনাবাহিনীর আইনের একত্রিশতম ধারার উল্লেখ করে বলা হয় কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীনে কোনো অপরাধ করলে কোর্ট মার্শালের বিচারে তাকে প্রাণদন্ড দেয়া হবে অথবা সেনাবাহিনীর আইন অনুযায়ী কোনো লঘু দন্ড দেয়া হবে। এতে বলা হয় সেনাবাহিনীর আইনের ১৩৩ ধারা অনুযায়ী কোর্ট মার্শালের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। কারণ কোর্ট মার্শাল কেবল ফৌজদারী আদালতই নয় বরং তা

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ন্যায় বিচারের আদালত।

শ্বেতপত্রে বলা হয় আরও ভালো ভাবে সুবিবেচনা ও ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করতে কোর্ট মার্শাল সাধারণত একাধিক অথচ বেজোড় সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে সেনাবাহিনীর আইন ও বিধি অনুযায়ী। সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ও শৃংখলা বিবেচনা করে এসব আদালতের গোপনে বিচারানুষ্ঠানের নিজস্ব অধিকার আছে।

চট্টগ্রাম সেনাবিদ্রোহের উল্লেখ করে শ্বেতপত্রে বলা হয় অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং অপরাধীদের সংখ্যা পদমর্যাদা বিবেচনা করে চীফ অব আর্মী স্টাফ অপরাধীদের বিচারের জন্যে নিম্নলিখিত অফিসারদের নিয়ে একটি সাধারণ কোর্ট মার্শাল গঠন করেন। মেজর জেনারেল আবদুর রহমান পিএসসির নেতৃত্বে বিগ্রেডিয়ার, কর্নেল ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল র‍্যাঙ্কের অপর ছজন অফিসারকে নিয়ে এই কোর্ট মার্শাল গঠিত হয়।

শ্বেতপত্রে বলা হয় সেনাবাহিনীর আইনের ৬৪তম বিধি অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সমূহ ঘটনা ও বিষয়কে আদালতে তুলে ধরায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো অন্যায় সুযোগ না নেয়া অথবা কোনো তথ্য প্রমাণ চেপে না যাওয়ায় আদালতকে সাহায্য করা মামলার জন্যে বাধ্যতামূলক।

শ্বেতপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশের বঙ্গানুবাদ নীচে তুলে দেয়া হলো :

তৃতীয় অধ্যায়

বিচার

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনের এখতিয়ারভুক্ত কোনো ব্যক্তি সেনা বিদ্রোহ অথবা অবাধ্যতা, বৈধ কমান্ড অমান্য অথবা সেনাবাহিনী হতে পালিয়ে যাওয়ার মতো কোনো সামরিক অপরাধ করলে কোর্ট-মার্শাল গঠন করে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কোর্টমার্শালে তার বিচার হবে। সেনাবাহিনী আইনের এখতিয়ারভুক্ত নয় এমন কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো অপরাধ করে যার প্রকৃতি সামরিক ও অসামরিক ধরনের হয়, অর্থাৎ বাংলাদেশ ফৌজদারী দন্ড বিধির সপ্তম অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ বিদ্রোহ উস্কানী করা, জওয়ানদের কর্তব্য পালন হতে বিরত করা এবং সেনাবাহিনী থেকে পালানোর চক্রান্ত করা প্রভৃতি)— তাহলে ফৌজদারী বিধির ১৩৯ ধারার বিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনী আইনেই তার বিচার হবে।

এই মামলায়, অর্থাৎ চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহের মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সকলেই সেনাবাহিনী আইনের এখতিয়ারভুক্ত এবং সেনাবাহিনী আইনের একত্রিশ ধারা অনুযায়ী তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে সেনাবিদ্রোহ ও অবাধ্যতার অভিযোগ আনা হয়েছে। এই সেনাবিদ্রোহ ও অবাধ্যতার পরিণতিতেই প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে। এটা এক গুরুতর সামরিক অপরাধ। সেনাবিদ্রোহ এমনই এক গুরুতর অপরাধ যা কেবল আর্মি কমান্ড ও শৃংখলাকে বিঘ্নিত করে না বরং দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে।

সেনাবাহিনী আইনের একত্রিশ ধারা অনুযায়ী সেনাবিদ্রোহ ও অবাধ্যতার অপরাধে অপরাধী হলে :

এই আইনের এখতিয়ারভুক্ত কোনো ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোনো অপরাধ করলে, অর্থাৎ :

১। বাংলাদেশের স্থল, নৌ অথবা বিমান বাহিনীতে কিংবা তাদের সঙ্গে সহযোগিতাকারী যেকোনো বাহিনীতে কোনো বিদ্রোহ করতে অথবা বিদ্রোহে যোগ দিতে শুরু করা, উৎসাহিত করা, বিদ্রোহ করা কিংবা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করা ; অথবা

২। এ ধরনের কোনো বিদ্রোহে উপস্থিত থাকা, এ ধরনের বিদ্রোহ দমনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না করা ; অথবা

৩। এ ধরনের কোনো বিদ্রোহের অস্তিত্ব অথবা এ ধরনের বিদ্রোহের কোনো অভিলাষ কিংবা এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রের কথা জানা সত্ত্বেও বা অস্তিত্ব আছে বলে মনে করার কারণ সত্ত্বেও বস্তুত বিলম্ব না করে তার কমান্ডিং অফিসারকে অথবা অপর কোন উর্ধতন অফিসারকে খবর না দিলে ; অথবা

৪। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী অথবা বিমান বাহিনীর কোনো ব্যক্তিকে তার কর্তব্য হতে বিরত রাখা অথবা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তার অনুগত্য হতে বিরত রাখার জন্যে উস্কানি দিলে,

কোর্টমার্শালের বিচারে তার প্রাণদন্ড দেয়া হবে অথবা উল্লিখিত এই আইনের অধীনে লঘু শাস্তি দেয়া হবে।

বাংলাদেশের অসামরিক আদালতগুলোর মতো কোর্ট মার্শাল (সামরিক আদালত) স্থায়ী প্রকৃতির আদালতে নয়। সুতরাং, প্রয়োজনের সময়, অপরাধীর অপরাধের প্রকৃতি ও অপরাধীর পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একটি কোর্ট মার্শাল গঠন করেন। সেনাবাহিনী আইনের ১৩৩ বিধির চতুর্থ নোট অনুযায়ী একটি কোর্ট মার্শাল একটি ফৌজদারী আদালত এবং একটি 'ন্যায় বিচারের আদালত'ও বটে। সেনাবাহিনী আইনের ১৩৩ ধারায় বলা হয়েছে, এ ধরনের, কোর্ট মার্শালের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং ভালোভাবে সুবিবেচনা করতে এবং উপযুক্ত ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করতে একটি কোর্ট মার্শাল সাধারণত গঠিত হয়ে থাকে একাধিক অথচ বেজোড় সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। সেনাবাহিনী আইন ও বিধি অনুযায়ী এসব আদালত সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ও শৃংখলা বিবেচনা করে গোপন বিচার অনুষ্ঠানের স্বকীয় অধিকারের অধিকারী বলে বিবেচিত।

আদালতের গঠন

এই ক্ষেত্রে (চট্টগ্রাম সেনাবিদ্রোহ) অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং অপরাধীদের সংখ্যা পদমর্যাদা ও অবস্থান বিবেচনা করে চীফ অব আর্মী স্টাফ সেনাবাহিনী আইনের ৩১ নং বিধি অনুযায়ী অপরাধীদের বিচারের জন্যে নিম্নলিখিত অফিসারদের সমন্বয়ে একটি সাধারণ কোর্ট মার্শাল গঠন করেন।

প্রেসিডেন্ট : মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবদুর রহমান পিএসসি।

সদস্য :

১। বিগ্রেডিয়ার নাসরাত আলী কোরেশী।
২। কর্নেল মোহাম্মদ মতিউর রহমান বিপি।
৩। কর্নেল মফিজুর রহমান চৌধুরী
৪। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ মাসুদ আলী খান, ইঞ্জিনীয়ার।
৫। লেঃ কর্নেল এম মকবুল হায়দার, সিগন্যালস।
৬। লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ হারিস, এএসসি।

বাদী এবং বিবাদী

এভিডেন্স এ্যাক্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ফৌজদারী আদালতের মতো প্রত্যেক কোর্ট মার্শালে অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব বাদী পক্ষের ওপর ন্যস্ত। বাদী পক্ষ সংশ্লিষ্ট সকল প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে কোর্ট মার্শালে অভিযোগ প্রমাণ করবেন। তবে সেনাবাহিনী আইনের ৬৪ তম বিধির ব্যবস্থানুযায়ী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আদালতকে সাহায্য করতে সকল ঘটনা ও বিষয় আদালতের সামনে হাজির করা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো অন্যায় সুবিধা গ্রহণ না করা অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোনো প্রমাণ চেপে না যাওয়া মামলার উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক। সুতরাং এ কর্তৃপক্ষ কোর্ট মার্শাল গঠনকারী নিম্নলিখিত বিভিন্ন র‍্যাংক ও কোরের সিনিয়র অফিসারদের কৌসুলী হিসেবে কাজ করতে নিযুক্ত করেন :

১। বিগ্রেডিয়ার নাজিরুল আজিজ চিশতি, পিএসসি।
২। কর্নেল এ এম এস এ আমিন, পিএসসি।
৩। লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু নঈম শামিন আহমেদ, পিএসসি, ইএসই।

সেনাবাহিনী আইনের তেইশতম বিধি অনুযায়ী কোর্ট মার্শালে বিচারের জন্যে কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে তাকে বিচারের জন্যে আনার কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টা আগে সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রমাণ অথবা তথ্য প্রমাণের সারাংশ সরবরাহ করা হবে। সুতরাং তাকে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ সুযোগ দেয়া হয়।

সেনাবাহিনী আইনের অষ্টাদশ বিধিতে বলা হয়, কোর্ট মার্শালের বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি কৌশুলী অথবা সেনাবাহিনী আইনে বর্ণিত অভিযুক্ত ব্যক্তির পছন্দসই আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অফিসার (ডিফেন্ডিং অফিসার) দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। তবে সেনাবাহিনী আইনের বিংশতিতম বিধি অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতা অনুযায়ী আদালত গঠনকারী কর্তৃপক্ষ সামরিক প্রয়োজনে ও শৃংখলার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে কৌশুলী নিয়োগ করতে নাও দিতে পারেন। সেনাবাহিনীর আইনের ছাব্বিশতম বিধি অনুযায়ী উক্ত একই কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির পছন্দসই আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অফিসার নির্বাচন করা স্থগিত রাখা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পছন্দ মাফিক ও প্রাপ্ত সুবিধা মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অফিসার দেয়া হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অফিসাররা সিনিয়র অফিসার এবং তাঁদের পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বহুমুখী অভিজ্ঞতার অধিকারী ও আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে তাঁদের সুনাম রয়েছে। তাঁরা সামরিক ও বেসামরিক আইন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এ ধরনের মামলা পরিচালনায় তাঁদের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এরা হচ্ছেন :

১। বিগ্রেডিয়ার এম আনোয়ার হোসেন,
২। কর্নেল মুহাম্মদ আইনুদ্দিন, পিএসসি, বিপি ;
৩। লেঃ কর্নেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বিপি, ই বেঙ্গল।

এছাড়াও সামরিক আইনের বিধান মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থনকারী অফিসারদের কয়েকজন বেসামরিক আইনজীবী কর্তৃক পরোক্ষ পরামর্শ দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন আইনজীবী অভিযুক্ত বিদ্রোহীদের পক্ষে ও অনুকূলে মামলায় তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন।

(চলবে)